প্রথম আলো

তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি—কোন রাজনীতি?

খোলা হাওয়া

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

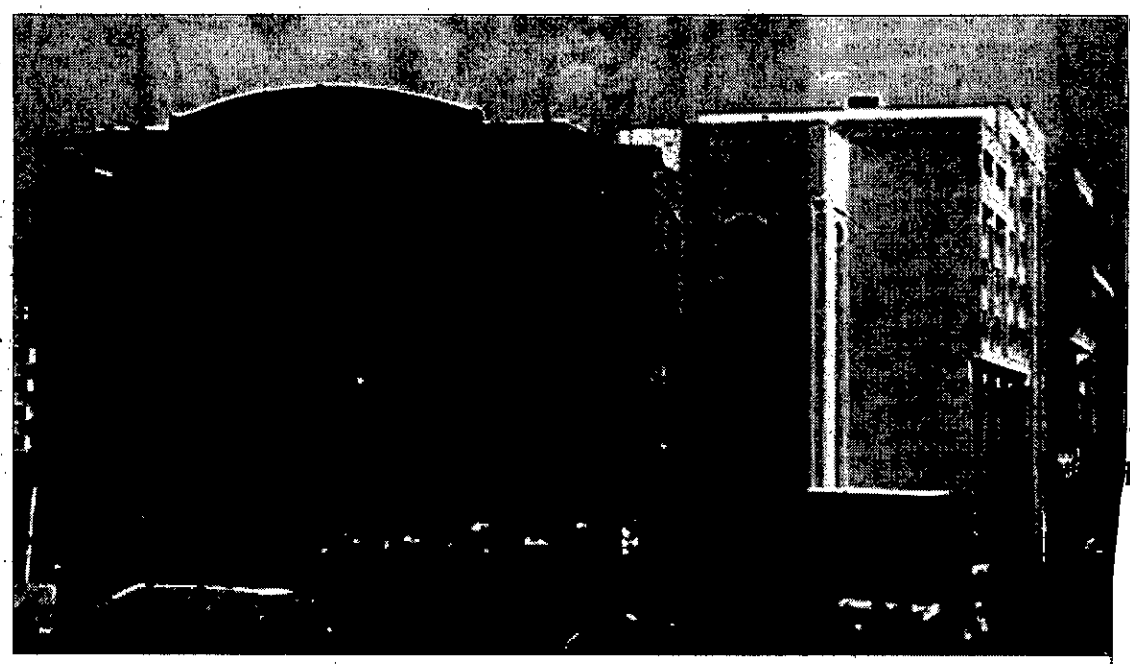

১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁ এবং ঈদের দিন শোলাকিয়া ঈদগাহের কিছু দূরে জঙ্গি হামলার পর অনেক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো স্বীকার করছে, এ দুটি হামলা সহিংসতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমাদের মনে হয়েছে, বাহিনীগুলো যদিও জানত যে এ ধরনের হামলা হতে পারে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাম্প্রতিক এক বক্তব্যে বিষয়টি স্বীকারও করে নিয়েছেন—এসব মোকাবিলায় তাঁদের তেমন কোনো প্রস্তুতি ছিল না।

এত দিনে সরকার যেমন গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, বাহিনীগুলোও নড়েচড়ে বসেছে। সরকার বলছে, জঙ্গি দমনে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই পদক্ষেপগুলোর একটি হচ্ছে সাধারণভাবে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদবিরোধী কর্মসূচি নেওয়া, কমিটি করা ইত্যাদি এবং বিশেষভাবে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জঙ্গি সম্পৃক্ততার কথা শোনা যাচ্ছে অথবা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোতে এসবের পাশাপাশি নজরদারিও বাড়ানো।

নতুন বাস্তবতার আরেকটি হলো, অনেক ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছেন। আগে এই অভিযোগ করা হতো শুধু মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধেই। এ প্রসঙ্গে নতুন আরেকটি বাস্তবতা অথবা পুরোনো বাস্তবতার নতুন একটি সংস্করণ হচ্ছে জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে না দেখে, অর্থাৎ এর প্রতিটি প্রসঙ্গ এবং প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে না দেখে একে মোটাদাগে ফেলা হচ্ছে। ফলে একদিকে সাধারণীকরণের প্রবণতা যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে ঢালাওভাবে নানান মন্তব্যও করা হচ্ছে। যেমন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হচ্ছে জঙ্গি তৈরির কারখানা। অনেকেই দাবি করছেন, জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগ আছে যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোক। কাগজে দেখলাম, গুলশান-বনানী-ধানমন্ডির আবাসিক এলাকাগুলো থেকে ক্যাফে-রেস্টুরেন্ট তুলে দেওয়া হচ্ছে। গুলশান-বনানীতে ২০০ বিশেষ রিকশা এবং (বোধ করি বিশেষ) ৩০টি বাস ছাড়া গণপরিবহন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

সাধারণীকরণের সমস্যা হচ্ছে, মাথাব্যথার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা না করে মাথাটাই কেটে ফেলা। ওষুধ আবিষ্কার দীর্ঘদিনের ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল—এর পেছনে মেধা, অভিনিবেশ ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। মাথা কেটে ফেলার জন্য এসব লাগে না, সময়ও খরচ হয় না।

কাগজে আরও দেখলাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার জঙ্গিবাদবিরোধী কার্যক্রমের উপায় নির্ধারণের জন্য ছাত্রলীগের সঙ্গেও বৈঠক করেছে। ছাত্রলীগ যেহেতু শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন, এর সঙ্গে বৈঠক মন্ত্রণালয় করতেই পারে, যেমন পারে শিক্ষক সমিতি বা কর্মচারী ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে। কিন্তু দেশে তো আরও অনেক ছাত্রসংগঠন আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তো কয়েকটি ছাত্রসংগঠনকে সক্রিয় দেখি। তারা শিক্ষার পক্ষে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে, শিক্ষার কিছু আদর্শের পক্ষে এখনো পথে নামে, যাদের দেখলে সেই ষাটের দশকের গণমুখী ও সংগ্রামী ছাত্রসংগঠনগুলোর কথা মনে পড়ে। তাদের কেন ওই বৈঠকে দেখা গেল না? তাদের ডাকা হয়েছিল কি না, আমি জানি না; যদি না হয়, তাদের কথাও তো শোনা উচিত।

কাগজে দেখলাম, ছাত্রলীগ দাবি করেছে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করার অধিকার দিতে হবে। সংগঠনটির মতে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নীরবে রাজনীতি করছে উগ্রবাদী সংগঠনগুলো অথচ ছাত্রসংগঠনগুলোকে রাজনীতি করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

আপাতদৃষ্টিতে এই দাবিটির একটি যৌক্তিকতা আছে, যদি রাজনীতির বিষয়টি চেতনাগত দিক থেকে বিবেচনা করা হয়। প্রথমত, যেকোনো উগ্র রাজনীতি শিক্ষার আদর্শের পরিপন্থী। শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে জ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়ে মেধাকে শাণিত করা, কল্পনাকে জাগ্রত করা, উদার মানবিক চেতনাকে বিস্তৃত করা। মানুষ, দেশ ও পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা ও নিষ্ঠা অবিচল করা এবং একই সঙ্গে বহু সংস্কৃতিকে লালন করার মধ্য দিয়ে একটি বৈশ্বিক দৃষ্টি অর্জন করা। সংকীর্ণ, উগ্র, সহিংস কোনো রাজনীতিই শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব বোধ, দক্ষতা অথবা সংবেদনশীলতা তৈরি হতে দেয় না। একই সঙ্গে একজন তরুণ শিক্ষার্থীকে সামাজিক অনাচার, বৈষম্য এবং শ্রেণি ও পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে, অংশগ্রহণমূলক, পরার্থপর সামাজিক ব্যবস্থা এবং সাম্য-অন্বেষী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পক্ষে সক্রিয় হতে অনুপ্রাণিত করে যে রাজনীতি, তার অনুসারী হতে কোনো প্রতিষ্ঠান বাধা দিতে পারে না। একজন তরুণ শিক্ষার্থীর অধিকার আছে সত্যনিষ্ঠ, গণমুখী রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানে তা চর্চা করার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তোতাপাখি বাহিনী তৈরির প্রতিষ্ঠান নয়, শুধু একটি-দুটি সনদ হাতে ধরিয়ে দিলে এবং বাজারের জন্য কিছু যোগ্যতা তৈরি করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের করপোরেট দুনিয়ার অথবা সরকারি চাকরির হিল্লা করে দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ শেষ হয়ে যায় না (অথবা তার কাজ ভালোভাবে শুরুও হয় না)। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান কাজ আলোকিত মানুষ তৈরি করা। সে রকম কর্তব্যের কথা সব শিক্ষা-দার্শনিক—এমার্সন থেকে নিয়ে নিউম্যান হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ছাত্রলীগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে রাজনীতি চালু করার কথা বলছে, তা কি এই আদর্শিক জ্ঞানভিত্তিক এবং দেশ ও মানুষকেন্দ্রিক রাজনীতি? যে ছাত্ররাজনীতি আমরা এই সময়ে (এবং গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন-পরবর্তী গত আড়াই দশকে) দেখছি, তার পরিচয়টা (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) খুব আশাজাগানিয়া নয়। বড় ছাত্রসংগঠনগুলো কাজ করে বড় দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসেবে। এদের কাছে মুখ্য হচ্ছে বড় দলগুলোর চিন্তা ও কর্মপরিকল্পনা, যার মূলে আছে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, নিরঙ্কুশ আধিপত্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গত আড়াই দশকে বড় ছাত্রসংগঠনগুলো প্রচুর সহিংসতা দেখিয়েছে। টেন্ডার ও নানাবিধ বাণিজ্যের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উঠেছে। গেস্টরুম সংস্কৃতি থেকে নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর জোর খাটানোর নানা অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই রাজনীতি শুরু হলে তার ফল যে খুব ইতিবাচক হবে না, তা সহজেই বলা যায়। এ জন্য এ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। হঠাৎ করে কিছু করে ফেললে ওই মাথাব্যথাটা আরও বাড়বে, মাথাটা কাটা না পড়লেও।

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার নানাভাবে যোগাযোগ রয়েছে। এর একটিতে আমি খণ্ডকালীন শিক্ষকতাও করছি। আমি দেখেছি, যে উগ্রবাদীদের কথা বলা হচ্ছে, তারা সংখ্যায় খুবই কম; কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের অস্তিত্বই নেই। বরং সব শিক্ষার্থীই ব্যস্ত পড়াশোনা শেষ করে একটা ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে যেতে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি কার্যকর। শিক্ষার্থীরা ক্লাস করা, টার্ম পেপার লেখা, পরীক্ষা দেওয়া—এসব কাজে এমন ব্যস্ত থাকেন যে অন্য কোনো দিকে নজর দেওয়ার সময় তাঁদের থাকে না। তারপরও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ থাকলে তাঁরা তা করেন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক আবদুস সেলিম সম্প্রতি একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নাটক করেছেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছেন। বিদেশে বিতর্ক করে পুরস্কার লাভ করেছেন। একই রকমভাবে কোনো কোনো শিক্ষার্থী উগ্রবাদের নীরব রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছেন। নর্থ সাউথ এই বিষয়টি আমলে আনেনি, সমস্যাটা তৈরি হয়েছে এই অমনোযোগিতার কারণে। আমি দেখেছি, শত ব্যস্ততাতেও শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ পেলে তাঁদের জন্য দেশে, দেশের বাইরে একটা শিক্ষাসফরের ব্যবস্থা হলে তাঁরা ভীষণ উৎসাহ নিয়ে তাতে অংশ নেন।

দোষটা শিক্ষার্থীদের নয়; তাঁরা ভালো কিছু করার জন্য তৈরি। কিন্তু ভালো কিছুর অভাব থাকলে এবং তাঁদের সামনে মন্দ জিনিস কেউ তুলে ধরলে তাঁরা সেটার প্রতি আকৃষ্ট হন। এভাবে তাঁরা মাদকেও অভ্যস্ত হন। নানা ভুল পথে যান।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে নতুন করে দৃষ্টি দিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পড়াশোনার চাপ কমছে, তাঁদের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাড়ছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পাঠ্যসূচিতেও তো জায়গা নিতে পারে। বাংলা সাহিত্য পড়ানো হয় না বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শন ও প্রকৃতি পাঠ হয় মাত্র কয়েকটিতে। খেলার মাঠ কোথায়? মুক্ত পরিসর কোথায়? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য অভিন্ন কিছু জায়গা আছে (যেমন আবাসিক হল, খেলার মাঠ); প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তা নেই। এসবের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে শিক্ষার্থীরা উদার মানবিকতার পাঠগুলো নিতে পারেন। যে শিক্ষা পরিসর নেই, অবসর উপভোগের উপায় নেই (অবসরও নেই), শিক্ষাঙ্গনে উদারতার উন্মেষ বা বিকাশ দুঃসাধ্য।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব পরিবর্তন এবং প্রকৃত শিক্ষার আবশ্যক শর্তগুলো প্রয়োগ করা গেলে উগ্রবাদ নিয়ে ভাবনাটা থাকবে না। আমিও চাই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতির সুযোগ থাকুক। কিন্তু সেই রাজনীতি, যা মহৎ কিছু আদর্শকে ধারণ করে, যার কেন্দ্রে আছে মানুষ ও দেশ—মানুষ ও দেশ নিয়ে ঠোঁটসেবা নয়, বরং প্রকৃত নিষ্ঠা। যে রাজনীতি সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা, বিনয় ও পরার্থপরতা শেখায়, সে রাজনীতি করতে না দেওয়াটাই তো কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি অপরাধ।

কিন্তু হঠাৎ করেই যদি বর্তমান ছাত্ররাজনীতির প্রধান মডেলগুলোর অনুসরণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি শুরু হয়, তা আমাদের ইতিবাচক কোনো পরিবর্তনের পথে নেবে না এবং ছাত্ররাজনীতির হাত ধরে যদি আবির্ভাব ঘটে শিক্ষকরাজনীতির (যার নজির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দৃশ্যমান), তাহলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হবে, যা শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করবে।

তবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক পরিবর্তন আনতে হবে, তাদের পর্যাপ্ত পরিসরসহ কাঠামোগত প্রচুর উন্নতি করতে হবে। এগুলোকে অনেক মানবিক ও শিক্ষার্থীবান্ধব হতে হবে, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্পন্ন হতে হবে। এ জন্য কোন রাজনীতি তা করতে সাহায্য করবে, তা নিয়ে ভাবনাটা এখনই শুরু করা যায়।

● সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।